একক ১ নির্ভরতা তত্ত্ব ঃ পরিচিতি

গঠন

১.১ পটভূমি

১.২ সংজ্ঞা

১.৩ কাঠামোগত চরিত্র

১.৪ মূল বক্তব্য

১.৫ তাৎপর্য

পটভূমি

নির্ভরতা তত্ত্বের জন্ম ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে, যখন ইউনাইটেড নেশনস ইকনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকার পরিচালক রল্ প্রেবিশ্চ (Raul Prebisch) এবং তাঁর সহযোগীরা লক্ষ্য করেন যে, উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। এই পর্যবেক্ষণ তাদের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইঙ্গিত করে যে, ধনী দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। নব্যসনাতনী তত্ত্ব (neoclassical theory) এই ধরনের কোনও সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেয়নি—তা ধরে নিয়েছিল যে সর্বদা সমান পরিমাণে না হলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের সুফল অল্পবিস্তর সকলেই ভোগ করতে সক্ষম হবে।

এই বিষয়ে প্রেবিশ্চের প্রাথমিক ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার। তাঁর মতে, দরিদ্র দেশগুলি প্রাথমিক পণ্যদ্রব্যগুলি ধনী দেশগুলিতে রপ্তানি করে। ধনী দেশগুলি সেগুলির সাহায্যেই পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং দরিদ্র দেশগুলিকেই সেই সব সামগ্রী আবার বিক্রী করে। কোনও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করার সময় যে মূল্য যুক্ত (value addedd) হয়, তা সেই পণ্যগুলির দামকে সর্বদাই তাদের প্রাথমিক উপাদানগুলির দামের থেকে বাড়িয়ে তোলে। কাজেই, রপ্তানি করে দরিদ্র দেশগুলি সেই পরিমাণ উপার্জন করতে পারে না, যার সাহায্যে তারা আমদানির খরচ মেটাতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানে প্রেবিশ্চ যে উপায় বাতলেছেন, সেটিও একই রকমের স্পষ্ট। দরিদ্র দেশগুলির উচিত বিকল্প আমদানি কর্মসূচী গ্রহণ করা যাতে ধনী দেশগুলি থেকে ব্যবহারযোগ্য পণ্যসামগ্রী আমদানি করার কোনও প্রয়োজন তাদের না হয়। দরিদ্র দেশগুলি আর্ন্তজাতিক বাজারে তাদের প্রাথমিক উপাদানগুলি বশ্যই বিক্রী করবে, কিন্তু তাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার বিদেশ থেকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী কেনার জন্য ব্যবহার করতে হবে না।

এই নীতি অনুসরণ করতে গেলে তিনটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত, যে অর্থনৈতিক মানদন্ড, অর্থাৎ বেশী পরিমাণ ক্রেতার ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ধনী দেশগুলি যেভাবে কম দামে পণ্য বিক্রী করতে পারে—দরিদ্র দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বাজার সেই পরিমাণ বড় নয়। দ্বিতীয় সমস্যার চরিত্রটি রাজনৈতিক—প্রাথমিক উপাদানগুলির উৎপাদক ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব অথবা কাম্য কীনা, সেই বিষয়ে দরিদ্র দেশগুলির দ্বিধা। তৃতীয় এবং শেষ সমস্যাটি হল প্রাথমিক উপাদানগুলির উপর দরিদ্র দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, বিশেষত বিদেশে সেগুলি বিক্রী করার ক্ষেত্রে। বিকল্প আমদানি নীতির পথে এই বাধাগুলিই কিছু মানুষকে ঋমী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে আরও সৃজনশীল ও ইতিহাসমুখী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দরিদ্র দেশগুলির একটানা দারিদ্রের এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে অধীনতা তত্ত্ব এই সময়ে নিজেকে উপস্থাপিত করে। চিরাচরিত নব্য সনাতনী তত্ত্ব এই বিষয়ে প্রায় নীরবই বলা যেতে পারে। নব্য সনাতনী তত্ত্বের একমাত্র বক্তব্য ছিল এই যে, মজবুত অর্থনীতির চর্চায় দরিদ্র দেশগুলি বিলম্বে যোগ দিয়েছিল এবং যখনই তারা আধুনিক অ নীতির কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেলবে, তখন থেকেই তাদের দারিদ্র হ্রাস পেতে আরম্ভ করবে। মার্কসাবাদী তাত্ত্বিকেরা অবশ্য এই একটানা দারিদ্রের জন্য ধনতান্ত্রিক শোষণকে দায়ী করেন। বিশ্বব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গি (world system approach) নামে পরিচিত এক নতুন চিন্তাধারা আবার দাবি করে যে দারিদ্র হল আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিবর্তনের এক প্রত্যক্ষ পরিণাম, যা এক কঠোর ও অনমনীয় শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে ধনীদের উপকার ও দরিদ্রদের ক্ষতি করেছে।

১.২ সংজ্ঞা

উদারপন্থী সংস্কারক (প্রেবিশ্চ), মার্কসবাদী চিন্তক (আন্দ্রেগুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক) এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের (ওয়ালার স্টেইন) প্রবক্তাদের মধ্যে যে সব বিতর্কের উৎপত্তি হয়, সেগুলি ছিল যেমন সজীব তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত। তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে এখনও মতভেদ রয়েছে, কাজেই তাকে একটিই সমন্বিত বা একীভূত (unified) তত্ত্ব হিসাবে ভাবা ভুল হবে। তবুও বেশিরভাগ তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণের মধ্যে কয়েকটি মূল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর বিদেশি প্রভাবের (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক) মাপকাঠিতে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রগতির ব্যাখ্যাকে নির্ভরতা সংজ্ঞা হিসাবে ধরা যেতে পারে। (Osvaldo Sunkel, "National Development Policy and External Dependence in Latin America," The Journal of Development Studies, vol. 6. no. 1, October 1969, p. 23)। থিওটোনিও দস স্যান্টোস তাঁর সংজ্ঞায় সম্পর্কের ঐতিহাসিক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঃ "নির্ভরতা হল একটি কয়েকটি দেশের ক্ষতিসাধন করে এবং অধীনস্থ অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে এক সীমিত গন্ডির মধ্যে আটকে রাখে..............এটি এমন এক অবস্থা যেখানে নির্ভরশীল দেশগুলির অর্থনীতির চাবিকাঠি থাকে নিয়ন্ত্রক দেশগুলির অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসারের হাতে" (Theotonio Dos Santos, "The

Structure of Dependence," in K T Fann and Donald C Hodges, eds. Readings in US Imperialism. Boston : Porter Sargent, 1971, p. 226)

নির্ভরতা তত্ত্বের বেশিরভাগ প্রবক্তাই অবশ্য এই সব সংজ্ঞাগুলির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেন। প্রথমত, নির্ভরতা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দুটি গোষ্ঠীতে বিভাজিত করে, যেগুলিকে কর্তৃত্বকারী/অধীনস্থ, কেন্দ্রীয়/প্রান্তিক অথবা মহানগরী/উপনগরী ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি সকেলেই উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ এবং Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)-র অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলি হল লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার সেই দেশগুলি যাদের মাথাপিছু জাতীর উৎপাদন কম এবং বিদেশী মুদ্রা উপার্দনের জন্য যারা শুধুমাত্র একটি কোন পণ্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত, দুটি সংজ্ঞাই ধরে নেয় যে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিদেশি শক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সব বহির্শক্তির মধ্যে আছে বহুজাতিক সংস্থা, আর্ন্তজাতিক পণ্যের বাজার, বিদেশী সহায়তা, যোগাযোগ এবং অন্য যে কোন পন্থা যার সাহায্যে উন্নত, শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি অন্যান্য দেশে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, নির্ভরতার সব কটি সংজ্ঞাই ইঙ্গিত করে যে কর্তৃত্বকারী ও নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক গতিশীল, কারণ এই দুই গোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়া (interaction) অসমতার চিত্রটিকে আরও পরিস্ফুট করে তোলে। এছাড়াও, নির্ভরতা এক গভীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার শিকড় নিহিত রয়েছে ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিকীকরণে। নির্ভরতা এক চলমান প্রক্রিয়া ঃ "ষোড়শ শতাব্দী থেকে এবং আজও লাতিন আমেরিকা অল্পোন্নতি অধুনা উন্নত দেশগুলির নিয়ন্ত্রিত এক আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থরা সঙ্গে নির্দিষ্ট শ্রেণির কিছু সম্পর্কের পরিণাম (Susarre Bodenheimer, "Dependency and Imperialism : The Roots of Latin American Underdevelopment," in Fann and Hodges, Readings, op. cit. p. 157)

সংক্ষেপে প্রকাশ করলে, রাষ্ট্রগুলি মধ্যেকার আন্তঃক্রিয়ার নকশাটি পরীক্ষানিরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রগুলির অসমতাকে এই আন্তঃক্রিয়ার এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাব দেখিয়ে নির্ভরতা তত্ত্ব আজকের বহু দেশের অল্পোন্নত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

১.৩ কাঠামোগত চরিত্র

নির্ভরতা তত্ত্বের বহু প্রবক্তা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রকেই নির্ভরতার সম্পর্কগুলির চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। এই বিষয়ে প্রথম দিকের তাত্ত্বিক আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্কের মতামত বেশ পরিস্কার ঃ "ঐতিহাসিক গবেষণার পলে দেখা গেছে যে, সমকালীন অল্পোন্নতি অধুনা কর্তত্বকারী দেশগুলি এবং অল্পোন্নত নির্ভরশীল দেশগুলির মধ্যেকার অতীতের ও বর্তমানের চালু থাকা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কের ঐতিহাসিক পরিণাম। এছাড়াও, এই সম্পর্কগুলি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ধনতন্ত্রের সামগ্রিক রূপের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ" (Andre Gunder Frank, "The Development of Underdevelopment," in James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank and Dale Johnson,

eds, Dependence and Underdevelopment. Garden City, New York : Anchor Books, 1972, p. 3)

এইমত অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে কঠোর আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের জন্ম হয়েছে, বিশ্বের বহু অঞ্চলে অল্পোন্নতির জন্য এই বিভাজনই দায়ী। অধীনস্থ বা নির্ভরশীল দেশগুলি সস্তা দরে খনিজ দ্রব্য, কৃষি পণ্য ও শ্রম সরবরাহ করে এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি, সেকেলে প্রযুক্তি ও উৎপাদিত সামগ্রীর এক ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। এর ফলে নির্ভরশীল দেশগুলির অর্থনীতি বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয় : এই সব দেশগুলিতে অর্থ, পণ্য, পরিষেবা পৌঁছয় ঠিকই, কিন্তু সেগুলির পরিমাণ নির্ধারণ করে তাদের নিজস্ব স্বার্থ নয়, কর্তৃত্বকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই শ্রম বিভাজনই হল দারিদ্রের প্রধান কারণ ও এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না যে ধনতন্ত্র কার্যকর সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই শ্রম বিভাজনকে এক অনিবার্য শর্ত মনে করে। এর স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রকাশ মেলে তুলনামূলক সুযোগসুবিধার নীতি বা মতবাদে।

এছাড়াও নির্ভরতার মডেলগুলির অনেকটাই এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগই ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত থাকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির হাতে, যা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের ধারণার সঙ্গে একমত। যদি এই অনুমান সত্যি হয়, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে কোন ধরনের প্রভেদই মিথ্যা হয়ে যায়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে বহুজাতিক সংস্থার মতো বেসরকারি সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় যে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা সকলেই মার্কসবাদী নন, আমাদের উচিত নির্ভরতা ও সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের মধ্যে এক স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানা। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রে বিস্তারকে ব্যবস্থা করে, যেখানে অধীনতা তত্ত্বের ব্যাখ্যার বিষয় হল অল্পোন্নতি। অন্যভাবে বলতে গেলে, মার্কসীয় তত্ত্বগুলি জানায় সাম্রাজ্যবাদ কেন ঘটে, যেখানে অধীনতা তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে। এই দুইয়ের প্রভেদ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কসবাদীদের মতে সাম্রাজ্যবাদ অনেক দিক থেকেই এমন একটি প্রক্রিয়ার অঙ্গ, যা বিশ্বের রূপান্তর ঘটায় ও তার ফলে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে অনুমোদনের সুরে মার্কস বলেছিলেন : "ভারতে ইংল্যান্ডকে দুটি লক্ষ্যপূরণ করতে হবে ঃ একটি ধ্বংসাত্মক অপরটি পুনরুজ্জীবনমূলক। অর্থাৎ প্রাচীন এশীয় সমাজের বিনাশ করা এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা (Karl Marx, "The Future Results of the British Rule in India," New York Daily Tribune, No. 3840, August 8, 1853). । নির্ভরতা তত্ত্বের মতে অল্পোন্নতি এক সম্পূর্ণ নেতিবাচক অবস্থা, যা নির্ভরশীল রাষ্ট্রকে কোনও রকম স্থায়ী ও স্বশাসিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দেয় না।

এছাড়াও মার্কসদের মতে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকেই নিজে বিনাশ করে, যেখানে অধীনতা বা নির্ভরশীলতার সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে থাকে। লেনিনবাদ অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদ তখনই ধ্বংস হয় যখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকা শোষণের সুযোগগুলি কব্জা করতে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়। লেনিনের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই বক্তব্যের এক বড় প্রমাণ। যুদ্ধ শেষ হবার পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির আগেকার উপনিবেশগুলি দখল করে। নির্ভরতা তত্ত্বের একজন প্রবক্তা এই বক্তব্য মানতে রাজি নন। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট পরিচয় যাই হোক না কেন, নির্ভরতা সম্পর্ক থাকতেই পারে। অধীনস্থ বা নির্ভরশীল এলাকা ভাগাভাগি নিয়ে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির লড়াই কোনওভাবেই তেমন প্রাসঙ্গিক তথ্য নয় (এই সম্ভাবনাটি বাদ দিয়ে যে কর্তৃত্বকারী দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে নির্ভরতার সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে সমগ্র আধুনিক যুগ ধরে পৃথিবীর প্রায় একই অঞ্চলগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্রের ঘটনা ঘটে চলেছে তা সেই অ লের কর্তৃত্ব যে রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক না কেন।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো তাত্ত্বিক নির্ভরতার সম্পর্কের চালিকাশক্তি হিসাবে ধনতন্ত্রকে চিহ্নিত করতে রাজী নন। এই সম্পর্ককে প্রথমেই বজায় রাখে এক ক্ষমতাব্যবস্থা, এবং এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রই এই ক্ষমতার পিছনে সমর্থন আগায়। যেমন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নির্ভরশীল দেশগুলির (পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ও কিউবা) মধ্যেকার সম্পর্ক এবং দরিদ্র ও উন্নতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অনেকটা একই রকম। কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে ক্ষমতার অসাম্যই নির্ভরতার জন্য বেশি দায়ী হবার সম্ভাবনাটি বেস কৌতূহল জনক এবং সেটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিরাচরিত বিশ্লেষণ, যেমন বাস্তববাদের (realism) সঙ্গো সঙ্গাতিপূর্ণ।

১.৪ মূল বক্তব্য

নির্ভরতা তত্ত্বের মূলে আছে বেশ কয়েকটি বক্তব্য, যাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই বিতর্কের অবকাশ আছে। বক্তব্যগুলির মধ্যে আছে :

১. অল্পোন্নত (underdeveloped) অবস্থার সঙ্গো অনুন্নত (underdevelped) অবস্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুন্নত বলতে এমন এক অবস্থা বোঝানো হয় যেখানে সম্পদকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যেমন, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে এক অনুন্নত অঞ্চল হিসাবে দেখতেন। কারণ, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার জমিতে সঠিকভাবে চাষ করা হত না। অল্পোন্নত হল এমন এক অবস্থা, যেখানে সম্পদকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তা এমনভাবে করা হচ্ছে যে এর সুফল ভোগ করছে শুধু কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি, সম্পদের মালিক দরিদ্র দেশগুলি নয়।

২. অল্পোন্নত ও অনুন্নত অবস্থার প্রভেদ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে এক সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশগুলি পিছিয়ে পড়া নয় বা ধনী দেশগুলিকে 'ধরে ফেলার' কোন প্রচেষ্টাতেও রত নয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) মূল্যবোধের বিচারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির থেকে পিছিয়ে পড়াও এদের দারিদ্রের কারণ নয়। তারা দরিদ্র কারণ শুধুমাত্র কাঁচা মালের উৎপাদক বা সস্তা শ্রমের ভান্ডার হিসাবে তাদের জোর করে ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গো প্রতিযোগিতায় নামতে পারে, তেমনভাবে তাদের সম্পদ বিপণনের সুযোগ থেকে রক্ষিত করা হয়েছে।

৩. নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে, কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির চাপিয়ে দেওয়া সম্পদ ব্যবহারের প্রণালী থেকে সরে গিয়ে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ অনেক বেশী কাম্য। এই কাম্য প্রণালীগুলির কোনা স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও কিছু কিছু শর্তের বা নীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, রপ্তানি কৃষির (export agriculture) যে নীতি কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি অনুসরণ করে, নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা তার বিরোধী। কারণ, রপ্তানির জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও বহু দরিদ্র দেশে অপুষ্টির হার মারাত্মকভাবে বেশী। বহু তাত্ত্বিকই মনে করেন যে অপুষ্টিক হার কমাতে কৃষিজমি ব্যবহার করা উচিত দেশের নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করার জন্য।

৪. আগের বক্তব্যটিকে আরও প্রসারিত কার যেতে পারে : নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তরা বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব এক স্পষ্ট "জাতীয়" অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে, যা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় এবং ব্যক্ত করা উচিত। এই বিষয়ে নির্ভরতা তত্ত্ব ও বাস্তববাদের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে একইরকম। নির্ভরতা তত্ত্বের স্বাত এইখানে যে এর প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় স্বার্থ শুধুমাত্র সমাজের দরিদ্র শ্রেণির প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব, ব্যবসায়ী শ্রেণি বা সরকারের তৃপ্তি সাধন করে না। দীর্ঘ মেয়াদী বিচারে দরিদ্রের জন্য পন্থা কী, তা নির্ণয় করা এক দুরূহ বিশ্লেষণমূলক সমস্যা। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের কোন প্রয়োগগত (operational) সংজ্ঞা নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা এখনও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি।

৫. দীর্ঘ সময় জুড়ে সম্পদ অপসারণের (একথা মনে রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের সময় থেকে অধীনতার সম্পর্ক চলে আসছে) এই প্রক্রিয়াটি শুধু কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলিই বজায় রাখেনা, তাদের সাহায্য করে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল দেশগুলির উচ্চশ্রেণির বা 'এলিট' (elite) সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাও। নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, এই 'এলিট' সম্প্রদায় নির্ভরতার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চান, তারণ তাদের নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ মিলে যায়। এরা প্রশিক্ষণ লাভ করেন কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলিতে এবপং তাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ভাগীদার হয়ে ওঠেন। কাজেই, নির্ভরতার সম্পর্ক বাস্তবে এক "স্বেচ্ছামূলক" সম্পর্ক। এ বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই যে, অধীনস্থ রাষ্ট্রের 'এলিট' সম্প্রদায় সচেতনভাবে নিজেদের দেশের দরিদ্র শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন ; তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে অর্থনৈতিক বিকাশের চাবিকাঠি আছে উদারপন্থী অর্থনৈতিক মতাদর্শের হাতে।

১.৫ তাৎপর্য

নির্ভরতা তত্ত্বের বিশ্লেষণটি যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে দরিদ্র অর্থনীতিগুলির বিকাশের প্রশ্নটি তুলনামূলক সুযোগসলুবিধা পুঁজি সঞ্চয় এবং আমদানি/রপ্তানি সংক্রান্ত চিরাচরিত প্রশ্নগুলির থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নতুন বিষয় হল ঃ

১. উন্নত, শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির সাফল্যকে এখনকার উন্নতিশীল অর্থনীতিগুলির আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয় না। যখন অর্থনৈতিক বিকাশ ছিল অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু, তখন বিশ্লেষণী কৌশল (এবং মতাদশ৪গত ঝোঁক) ছিল যথেষ্ট স্পষ্ট : প্রত্যেকটি দেশেরই প্রয়োজন ছিল ঋণী দেশগুলির নকশা অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ ও ১৯৬০-র দশকে এক ঐকমত্য দেখা দিয়েছিল যে বিকাশের

কৌশল (growth strategy) বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, যে ঐক্যমতের সব থেকে স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে ওয়াল্ট রসেটোডের 'দি স্টেজস অফ ইকনমিক গ্রোথ' গ্রন্থে। নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে, ধনী দেশগুলির সাফল্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যন্ত অনিশ্চিত ও নির্দিষ্ট পর্যায়, যার নিয়ন্ত্রমের ক্ষমতা ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির অত্যন্ত শোষণমূলক উপনিবেশীয় সম্পর্কগুলির হাতে। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা এখন খুবই কম।

২. নির্ভরতা তত্ত্ব কেন্দ্রীয় বন্টন পদ্ধতির নব্য সনাতনী চুঁইয়ে পড়া মডেলটিকে অস্বীকার করে, যাকে সাধারণত (trickle-down) অর্থনীতি আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের নব্য সনাতনী মডেলটি সম্পদ বন্টনের বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর প্রাথমিক সম্পর্ক হল কার্যকর উৎপাদনের সঙ্গে এবং এ ধরে নেয় যে, বাজার যুক্তিসঙ্গত ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় এই কার্যকর উৎপাদনের পুরস্কার দেবে। কোনও সুসংহত, প্রবহমান অর্থনীতির ভিতরে—যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং যেখানে ব্যবহার বা ক্রয়ের ধরনগুলি জাতি, বণ, লি   ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক (non-economic) পক্ষপাতের হাতে বিকৃত হয়ে ওঠে না—অবশ্য এই অনুমান প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। উন্নতিশীল অর্থনীতিগুলিতে এই পি   তিগুলি পরিব্যাপ্ত নয় এবং নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তরা মনে করেন যে দরিদ্র অর্থনীতিগুলিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজে ছড়িয়ে পড়ে না। এই সব কাঠামোগত কারণে এই তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, বন্টনব্যবস্থার জন্য শুধুমাত্র বাজার যথেষ্ট নয়।

৩. বাজার যেহেতু   ধু উৎপাদনশীলতার মুল্য দেয়, তাই নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা জিডিপি (GDP) অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন বা বাণিজ্য সূচকের (tradeindice) মত সমষ্টিগত পরিমাপকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল রাষ্ট্রের মধ্যেও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চলে। কিন্তু তাঁরা অর্থনৈতিক বিকাশ (economic growth) ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের (economic development) মধ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন। যেমন, অধীনতার কাঠামোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিকভাবে দেশের উপকার করছে কী না। সেই কারণে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (Life expectancy), সাক্ষরতা, শিশু মৃত্যুর হার, শিক্ষার মত সূচকগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্ভরতা তত্ত্ব স্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক সূচকগুলির থেকে সামাজিক সূচকগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়.

৪. কাজেই নির্ভরশীল বা অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির উচিত স্বনির্ভরতার নীতি অনুসরণ করা। আর্ন্তজাতিক অর্থ ভান্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুমোদিত নব্য সনাতনী মডেল যাই বলুক না কেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশী করে জড়িয়ে পড়া দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে অবধারিতভাবে মঙ্গলজনক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রায়শই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতির সমার্থক বলে মনে করা হয় এবং এই নীতি নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়েছে, যেমন চীনে 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড' (great Leap Forward) বা উনি তান জানিয়াতে 'উজামা' (Ujamaa)। এই নীতিগুলির ব্যর্থতা এখন পরিস্কার এবং এই ব্যর্থতাই ইঙ্গিত করে যে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এক সঠিক নির্বাচন নয়। বরং স্বনির্ভরতার নীতিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে এক নিয়ন্ত্রিত আন্ত:ক্রিয়াকে অনুমোদন করে। বেশীর ভাগ নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করবে শুধুমাত্র এই শর্তেই দরিদ্র দেশগুলির বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আদানপ্রদানে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

একক ২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

২.৩ কিউবার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান

২.৪ উপসংহার

ভূমিকা

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বহু সংখ্যক দেশের অল্পোন্নতি ও অতি ক্ষুদ্র এক অংশ, যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলির সমৃদ্ধির অনেক কারণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে আমরা এই বৈষম্যের উৎস, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলির উপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গ এই বিষয়ে নব্য মার্কসাবদী তাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কিউবা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গো দেখব একটি দেশ কীভাবে তার নির্ভরশীলতার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে ও কেন এই দৃষ্টান্তটি অন্যান্য অল্পোন্নত দেশগুলিতে আশার সঞ্চার করতে পারে অথবা পারে না।

২.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক বিস্তার ও মেরুভবনের (ঠান্ডা যুদ্ধের শুরু) যুগ দেখা দেয়, যার আলোকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা তৃতীয় বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহ বোধ করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রাজনৈতিক সুস্থিরতা প্রতিষ্ঠা করা (সো: ১৯৯০)। কিন্তু উন্নয়নের আধুনিকীকরণের ধারার এই সমাজবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য যে দেশগুলি, সেখানকার স্থানীয় বিদ্বজনেরা নিজেরাই তাদের নিজস্ব তত্ত্ব গঠন করতে শুরু করেন। এর কারণ অংশত হল আধুনিকীকরণ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নীতিগুলির সন্তোষজনক ফল দিতে ব্যর্থতা এবং তার সঙ্গো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে "সক্রিয় উপায়ে যেখানে তাঁরা করছেন, সেই প্রান্তিক সমাজগুলিকে অল্পোন্নত করে রেখেছে" (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইকনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকা (ইসিএলএ-ECLA) কর্মসূচীর চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে লাতিন আমেরিকাতেই প্রথম আধুনিকীকরণের ধারার (Modernization school) পর্যালোচনা শুরু হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কর্মসূচী (ECLA) সংরক্ষণনীতি (Protectionist policy) ও তার সঙ্গো বিকল্প আমদানির মাধ্যমে শিল্পায়নকে উৎসাহ যোগায়, যার ফলে ১৯৫০-র দশকে এক স্বল্পস্থায়ী অর্থনৈতিক

প্রসারের পরেই দেখা দেয় অর্থনৈতিক নিশ্চলতা (কর্মহীনতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি)। সামগ্রিকভাবে, ECLA-র ব্যর্থতা ও তার পরিণতি হিসাবে আধুনিকীকরণের ধারার ক্রমশ লুপ্তি এবং এর সঙ্গো সনাতন মার্কসবাদের সঙ্কটের ফলেই জন্ম নেয় আজকের নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বগুলি।

সনাতনী নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব : তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অল্পোন্নতি ও নির্ভরতা তত্ত্বের নতুন সংজ্ঞা নিরুপণের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস করেন পল বারান ও আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক।

বারানের মতে 'পিছিয়ে পড়া' বা 'অনগ্রসর' দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল তাদের দ্বৈত অর্থনীতি : এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও এক ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্র (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। কৃষিজাত পণ্য থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতির সৃষ্টির সম্ভাবনা এখনও অতি সামান্য। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের একশো চল্লিশ কোটি কৃষিজীবীর বিশ্ব বাণিজ্যে অবদান মাত্র তেরো শতাংশ (কিট : ২০০২)। বারানের মতে, উন্নয়নের পথে প্রাথমিক বাধাগুলি হল শ্রেণী সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতি ব্যবহারের উপর তার পর্‌ভাব এবং ক্ষমতার বন্টন। অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমাধান (নির্ভরতা থেকে মুক্তি) হল এইরকম : অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রগুলির বিকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পায়নকে উৎসাহ দেওয়া (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। এই বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কের বক্তব্য বারানের বিপরীত।

ফ্রাঙ্কের মতে, অল্পোন্নতি বা 'অল্পোন্নতির অগ্রগতি-'র (development of underdevelopment) মূল কারণ হল 'মহানগরী' (metropole) ও 'উপনগরী'-র (satellite) ধারণা, যেখানে বাণিজ্যিক পুঁজির লক্ষ্যস্থল হল 'মহানগরী' এবং উপনগরী'-র অস্তিত্ব স্রেফ 'মহানগরী'-র প্রয়োজন মেটানোর জন্য। উদ্ধৃত অর্থনীতি সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল বাণিজ্য ও অন্যান্য ধরনের পণ্য ও পরিষেবা বিনিময়, যার মধ্যে রয়েছে আর্ন্তজাতিক এবং প্রান্তিক সমাজগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিনিময়ও। নির্ভরতার সমস্যার সমাধান হিসাবে ফ্র্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উচিত কার্যকরভাবে বিশ্ব বাজার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া, যাতে একটি দেশ বিকাশের সুযোগ পায় (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। আধুনিকীকরণের দ্বার যেখানে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে সেখানকার সংস্কৃতি, সঠিক জনসংখ্যা, বিনিয়োগের অভাব এবং এমনকী 'প্রকৃত সৃজনশীল' কিছু করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অনীহা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছে, ফ্র্যাঙ্ক যেখানে সোজাসুজি দায়ী করেছেন বাইরের কারণগুলিকে (যেমন তাদের উপনিবেশবাদের ইতিহাস)। এছাড়াও, ফ্র্যাঙ্ক দাবি করেন যে পাশ্চাত্য 'মহানগরী'-গুলিতে এই একই উন্নয়নের প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের 'উপনগরী'-গুলিতে একই সময়ে অল্পোন্নতিকে জিইয়ে রাখে (সো : ১৯৯০)।

শেষে সামির আমিন ও আরঘিরি এমানুয়েলের বক্তব্যের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কৃষি-শিল্প বা মহানগরী-উপনগরী থেকে আমিন কেন্দ্র (centre) ও প্রান্তে-র (periphery) ধারণায় সরে এসেছিলেন, যেখানে রয়েছে এক কেন্দ্র, যার আছে সাধারণত এক স্বনির্ভর, স্বকেন্দ্রিক (autocentric) পুনরুৎপাদনের কাঠামো এবং রয়েছে এক প্রান্তিক অর্থনীতি, যার বৈশিষ্ট্য হল এক 'অত্যুন্নত' (overdeveloped) রপ্তানি ক্ষেত্র (প্রকৃত অর্থে শোষিত) এবং যেখানে কৃষকেরা নিজেদের জন্য উৎপাদন করে আঞ্চলিক উন্নয়নকে

উদ্দাপিত করার বদলে বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত ও বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসে। একটা সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক। ধরা যাক আয়ারল্যান্ডের একটি সুপারমার্কেটে মোজাম্বিক বা কেনিয়ার উৎপাদিত শাকসব্জি সুন্দর মোড়কে শোভিত হয়ে বিক্রি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আয়ারল্যান্ডের মানুষদের কাছে ওই শাকসব্জি তেমন কোন প্রয়োজন নেই, বরং মোজাম্বিক বা কেনিয়ার কৃষকেরা তাদের উর্বর জমিতে ওর চআষ করে নিজেদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করলে উপকৃত হত। এই 'অত্যুন্নত' রপ্তানি ক্ষেত্র ও তার সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক অর্থনীতির অধীনতার সঙ্গো আছে কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অর্থনীতিগুলির মধ্যে পণ্যের অসম বিনিময়ের সমস্যা, যাকে এমানুয়েল (১৯৭২) এক তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন। কেন্দ্র বা প্রান্ত, কোথায় তারা কাজ করছে তার উপর ভিত্তি করে এখনও তাদের মজুরি নির্ণয় করা এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনে (রপ্তানি) ব্যবহৃত শ্রম ও প্রান্তিক দেশগুলিতে আমদানি করা পণ্যের (প্রযুক্তি, যন্ত্র) অসম বিনিময়কে এমানুয়েল সমস্যা হিসাবে দেখেছিলেন। সেনব্যাস (২০০1) আমিনকেই এই অসম বিনিময়ের ধারণার জন্য কৃতিত্ব আরোপ করেন। আমিন তাঁর পরের রচনা গুলিতে এমানুয়েলের ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেখানে তিনি অসম বিনিময়কে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে এক সুপরিকল্পিত, 'বিশৃঙ্খল' (disturbed) ধনসঞ্চয়ের সক্রিয় শক্তি হিসাবে অভিহিত করেছেন, যা জন্ম দেয় এক অসমান আন্তঃনির্ভরতার। তাঁর মতে, এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন সংযুক্তি ও বিযুক্তির এক মিশ্র কৌশলের মাধ্যমে সক্রিয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের, যা বিশ্ব ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশীয় উন্নয়নকে উদ্দীপিত করবে।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বগুলির প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই তত্ত্বগুলি অল্পোন্নতি ও নির্ভরতাকে তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। বেশীরভাগ প্রবক্তাই পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির পিছনে বাইরের কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, অসম বিনিময়কে 'অন্য' দেশের চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে করেছেন এবং তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো হল কেন্দ্র বনাম প্রান্ত। তাঁদের প্রস্তাবিত সমাধানের মধ্যে আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গো সঙ্গো আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থার সঙ্গো সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ছেদ করা।

তত্ত্বগুলির প্রসারণ : এই 'সনাতনী' নির্ভরতা তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আরও পরীক্ষালব্ধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তা থেকে মনে হয় যে প্রচলিত তত্ত্বের সাহায্যে সমস্ত তথ্য বা পর্যবেক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় অল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রকৃত পরিবর্তন মানে সেই দেশগুলির মধ্যেই আবার বর্ধিত পৃথকীকরণ (মার্টিন্সেন : ১৯৯৭)। অন্য ভাবে বললে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একটি সমজাতীয় (homogeneous) গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বরং তাদের নিডস্ব (উপনিবেশবাদী) ঐতিহ্য এবং সামাজিক কাঠামোগুলি অন্তত বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর জন্য আবার প্রয়োজন সনাতনী নব্য মার্কসবাদের অপেক্ষাকৃত আবদ্ধ ধারণাগুলিকে প্রসারিত করা এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। 'নতুন নির্ভরতা' ('new dependency') বিতর্কে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এফ এইচ কার্ডোসো এবং তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলির জন্য ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন-এর (ওয়ালারস্টেইন-এর পরবর্তী রচনাগুলিকে যদিও 'বিশ্ব ব্যবস্থা ধারা'-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। এই নতুন ধারণাগুলির সঙ্গো সনাতনী নির্ভরতার ধারার সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে এক নম্বর সারণিতে দেখানো হয়েছে। (সারণি নং ১ দ্রষ্টব্য)

কার্ডোসোর দাবি, বিভিন্ন রকমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার (ইতিহাস, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি) উপর নির্ভর করে বাইরের কারণগুলির প্রভাবও বিভিন্ন রকমের হবে। ফ্র্যাঙ্কের বিপরীত অবস্থান থেকে তিনি অধীনস্থ সমাজগুলির জাতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন এবং উন্নয়নকে রূপ দিতে তারা সক্ষম বলে মনে করেছিলেন। আমিনের স্বকেন্দ্রিক পুনরুৎপাদন নয়, এর ফলে দেখা দেয় বর্ধনশীল নির্ভরতা (development in dependency), যাকে নির্ভরশীল বা অধীন উন্নয়ন নামেও অভিহিত করা হয় (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। নির্ভরশীল উন্নয়নের এক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল লোম কনভেনশনের (Lome convention) স্থাপন ও তার 'স্থায়ী' চরিত্র। ওয়ালারস্টেইনের পরবর্তী রচনাগুলিকে বিশ্ব ব্যবস্থা-ধর্মী বলে গণ্য করা হলেও তাঁর ভাবনায় বহু নির্ভরতার ধারার (Dependency school) ধারণার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, যেমন অসম বিনিময় ও কেন্দ্র-প্রান্ত শোষণ (সো : ১৯৯০)। কিন্তু নির্ভরতা ও অল্পোন্নতির বিষয়গুলিকে তিনি প্রত্যেকটি পৃথক রাষ্ট্র এবং বিশ্ব ব্যবস্থার ভিতরে তার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭) যেখানে নির্ভরতা তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তারা জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নত করে চোখে পড়া সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

নির্ভরতা তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা কীরকম? ১৯৬০-র দশক থেকে বিশ্ব জুড়ে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে—রাজনৈতিক কাঠামোগুলির আর্ন্তজাতিককীকরণ হয়েছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি উপস্থিতি ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ও নব্য উদারতন্ত্র (neo-liberalism) এই সময়ের সম্ভবত সবথেকে বেশি নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমিন (২০০১), ফারাগ (২০০২) ও সুরিন (১৯৯৮)-এর সাম্প্রতিক রচনাগুলিতে নির্ভরতার ধারা এবং বিশ্ব ব্যবস্থার ভাবনার কিছু মিশ্রণ লক্ষ্য করা গেছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর লগ্নির বাজারের (financial market) ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাবের গুরুত্ব স্বীকার করা (অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির মাধ্যমে নয়, স্রেফ টাকা খাটিয়ে 'উদ্বৃত্ত' অর্থের সৃষ্টি করা, যার কোন স্থিতিশীলতা নেই। তাত্ত্বিক কাঠামোটি অবশ্য এখনও দ্বিমাত্রিক (কেন্দ্র-প্রান্ত) ও নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic) উন্নয়ন ভিত্তিক, যদিও আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত আরও পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে অর্থাৎ গত কুড়ি কি ত্রিশ বছরে যে দেশগুলি তুলনামূলক বিচারে আরও বেশী বঞ্চিত হয়েছে (ফারাগ ২০০২ ; সুরিন ১৯৯৮), তাদের আমিন 'চতুর্থ বিশ্ব' নামে অভিহিত করেছেন। এই বিচারে তৃতীয় বিশ্বকে 'আধা-প্রান্তিক' (Semiperiphery) ও চতুর্থ বিশ্বকে 'প্রান্তিক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যদিও আমিন এই শ্রেণী বিভাজনের কথা উল্লেখ করেননি। অন্য দিকে, ওয়ালারস্টেইন বিশ্ব ব্যবস্থার তত্ত্বগুলিকে পুরোপুরি অনুসরণ করলেও সাম্প্রতিক এক রচনায় (২০০২) জাতীয় স্তরে শ্রেণী কাঠামো ও সমাজের বিষয়গুলির উপর নজর দিয়েছেন।

২.৩ কিউবার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান

এ কথা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে গত দশ বছর ধরে উন্নয়নও নির্ভরতা সংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রথাগত ধারণাই কিউবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। প্রথমে আমরা ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ অবধি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব, পরে কৃষিক্ষেত্র ও বিশেষ করে কিউবার সমাজে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার দিকে নজর দেব এবং

শেষে নির্ভরতার জালে এখনও আটকে থাকা অন্যান্য দেশগুলির কাছে কিউবা কীভাবে এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করব।

বিকল্প মডেল : নির্ভরতা তত্ত্বের সনাতনী ধারা যাকে নির্ভরতার অবসানের পূর্বশর্ত মনে করে, কিউবায় সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি প্রত্যাশামতো বদলায়নি। এখন চল্লিশ বছর দীর্ঘ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার দরুন কিউবা সোভিয়েত জোটের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়ে COMECON-এর (Council for Mutual Economci Assistance) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে। এর ফলে ক্রমাগত আখ রপ্তানি করা হতে থাকে এবং শিল্পে ব্যবহার করার যন্ত্রপাতি, পেট্রল, কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য (agro-chemicals) ও প্রধান খাদ্যসামগ্রীগুলি বেশি করে আমদানি করা হতে থাকে (রসেট ও বেঞ্জামিন : ১৯১৪ ও এনরিকুয়েজ : ২০০০), যা আধুনিকীকরণের ধারার বক্তব্য অনুসরণ করে কৃষির সনাতনী মডেল মেনে চলারই সমান (ওয়ালারস্টেইন : ২০০২ ও এনরিকুয়েজ : ২০০০)। এছাড়াও কিউবার আখের জন্য সোভিয়েতরা আন্তর্জাতিক বাজারের দামের থেকে ৫.৪ গুণ বেশি দিত, যা কিউবার বিদেশী মুদ্রার ভান্ডারের আশি শতাংশ যোগান দিতে এবং যার ফলে কিউবার সামাজিক উন্নয়ন অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। এর কিছু অভ্যন্তরীণ সুফল হয়েছিল, যেমন এক চমৎকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তুলনামূলক বিচারে এক প্রশংসনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এগুলির জন্য একে আধা-প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত করাই যথার্থ মনে করা হচ্ছি, কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান সোভিয়েত জোটের সঙ্গে কিউবার নির্ভরতার সম্পর্কটিরও আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটায় "হঠাৎই কিউবার বাণিজ্য বছরে আট বিলিয়ন ডলার হ্রাস পায়, আমদানি পঁচাত্তর শতাংশ হ্রাস পায় যার মধ্যে আছে খাদ্যসাগ্রী, যন্ত্রাংশ, কৃষি-রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহারের যন্ত্রপাতি" (ডঃ ফিউনেসকে উদ্ধৃত করে পার্কার : ২০০২)। অন্যান্য সূত্রের মতে, কীটনাশক আমদানি হ্রাস পায় বিরাশি শতাংশ (রসেট : ২০০২) ও কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার নব্বই শতাংশের বেশী কমে যায় (রসেট ও বেঞ্জামিন : ১৯৯৪)। আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার হল এই যে, "আমদানি-কৃত সামগ্রী থেকে নাগরিকদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ সাতান্ন থেকে চুয়াল্লিশ শতাংশে নেমে যায়" (এনরিকুয়েজ : ২০০০), যা সেখানে এক সম্ভাব্য খাদ্য সঙ্কটের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং তখনও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকায় ও রাতারাতি তার বাণিজ্যসঙ্গীকে হারানোর ফলে কিউবাকে বিকল্প পথের অনুসন্ধান করতে হয়, যারা সাহয্যে নাগরিকদের এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। ঠিক এইখানেই কিউবার নিজস্ব ও অনন্য সাধারণ সামাজিক কাঠামো পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দেয় : রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পকিল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেখানকার উচ্চশিক্ষিত নাগরিকেরা এক চমকপ্রদ 'সবুজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' ('greening of the socialist revolution) ঘটিয়ে ফেলেন, যা এখন বিকল্প মডেল নামে পরিচিত। কৃষিব্যবস্থায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, সেগুলি হল :

জৈব কৃষির বিকাশ, যার অন্তর্ভুক্ত হল জৈব-সার ও জৈব-কীটনাশকের গবেষণাসিদ্ধ প্রয়োগ ও পর্যায়ক্রমে শস্যের চাষ (Crop rotation)।

রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বড় বড় খামারের জায়গায় ছোট ছোট কর্মসংস্থান গঠন করা ও পরিচালক মন্ডলীর আয়তন কমিয়েও দেশ জুড়ে এক সুসমন্বিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বজায় রাখা যার মধ্যে আছে উৎপাদনের অনুপাতে মজুর দেওয়া ও জমির মালিকানার অধিকার দেওয়ার নতুন নিয়মগুলি।

নগরভিত্তিক কৃষির (Urban agriculture) প্রচলন করা (যাকে ‘agroponicos’ বা ‘organoponicos বলা হয়ে থাকে), যাতে এক লক্ষ লতের হাজার কর্মী নিযুক্ত থাকে এবং গ্রামে উৎপাদিত শাকসব্জীর থেকে কম দামে সমগ্র কিউবার প্রয়োজনের অর্ধেকই যে ব্যবস্থায় উৎপাদন করা হয় থাকে (কোভালেস্কি : ১৯৯৯)।

কিউবার নাগরিকেরা এখনও খাদ্য সঙ্কট থেকে মুক্তি না পেলেও এবং ১৯৯১-৯৫ সময়কালে খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ কমপক্ষে ষাট শতাংশে এসে দাঁড়ালেও (কোভালেস্কি : ১৯৯৯), কিউবায় কৃষি উৎপাদন বেশীরভাগ অঞ্চলেই ১৯৮০-র (পার্কার : ২০০২) স্তরে উঠেছে এসেছে এবং জৈব-কৃষির ক্ষেত্রে কিউবা এখন বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশে পরিণত হয়েছে (রসেট ঃ ২০০২)।

নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচার উপায় ? : “আমাদের বলা হয় যে ছোট দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না এবং দেশজ কৃষির অভাব পূরণ করার জন্য আমদানি করতে বাধ্য হয়। আমরা এটাও শুনে থাকি যে কৃত্রিম কৃষি-রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়া কোন দেশ তার নিজের জন্য যথেষ্ট খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিউবা কিন্তু কার্যত এই সবকটি ধারণাকেই ভুল প্রমাণ করে চলেছে। আমাদের বলা হয়, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বড় বড় বাণিজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্মদক্ষতা। অথচ খাদ্য সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার পথে কিউবাকে নেতৃত্ব দিয়েছে ছোট ছোট কৃষকেরাই। আমরা বারবার শুনে থাকি যে খাদ্যাভাব দূর করার একমাত্র উপায় হল আর্ন্তজাতিক সহায়তা, কিন্তু স্থানীয় উৎপাদনের মধ্যেই কিউবা তার বিকল্প পন্থাকে আবিষ্কার করে নিয়েছে” (রসেট : ২০০০)। এটা স্বীকার করতে হবে যে ১৯৯০-র দশকে কিউবা যথেষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটচাও সত্যি যে, কিউবা প্রমাণ করতে পেরেছে যে অধীনতার ধারার-র তথাকথিত ‘সংযোগচ্যুতি’ (de-linking) যথেষ্ট সম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে, এই বিকল্প মডেল কি অন্যান্য নির্ভরশীল রাষ্ট্রের ‘ব্লুপ্রিন্ট’ বা ভবিষ্যত পরিকল্পনার নকশা হতে পারে ? বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করতে পারেন যে কিউবা ইতিমধ্যেই আধা-প্রান্তিক জায়গায় অবস্থান করছিল, কারণ সেখানকার উচ্চশিক্ষিত নাগরিকেরাই অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নব্য মার্কসবাদীরা অবশ্য এর জন্য কৃতিত্ব দেন কিউবার তৎকালীন সামাজিক কাঠামোকে। এই প্রসঙ্গে এনরিকুয়েজ (২০০০) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চীন ও ভিয়েতনামের দিকে, যেখানে একই ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে, যদিও বা কিঞ্চিত ধীর গতিতে। তিনি বলেন যে সোভিয়েত জোটের দেশগুলি এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত কারণ সেখানে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা কাঠামোর আর অস্তিত্ব নেই। এনরিকুয়েজ আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত এই পরিবর্তনের উপর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, কারণ তা কিউবাতে শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে এক ধরনের নির্ভরতার জায়গায় অন্য ধরনের (নব্য উদারপন্থী) নির্ভরতার প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি এবং এসম বিনিময়ের অবসান হয়েছিল।

নিজেদের অর্থনীতি সামলাতে যখন অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশগুলি একে একে তাদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছিল (অ্যানন : ২০০২), তখন কিউবা প্রমাণ করেছিল যে তার মত একটি তথাকথিত আধা-প্রান্তিক দেশও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। এই মুহূর্তে অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের

বেশিরভাগ দেশেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ও যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত নাগরিক নেই বা নব্য উদারতন্ত্রকে বুখতে তাদের উপরে কোনও মার্কিন নিষেধাজ্ঞাও নেই—কাজেই স্বাধীন উন্নয়নের জন্য কিউবাকে ঠিক এখনও 'ব্লুপ্রিন্ট' ভাবার সময় হয়নি। কিন্তু কিউবা অবশ্যই এই আশার জন্ম দেয় যে, মৌলিক ও সৃজনশীল উপায় খুঁজে নিয়ে নির্ভরতার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

২.৪ উপসংহার

আধুনিকীকরমের ধারার সুপারিশ করা উন্নয়নের নীতিগুলি সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় উন্নতিশীল দেশগুলির কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন তত্ত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। এই তত্ত্বগুলি বিশ্বকে কেন্দ্র ও প্রান্ত, এই দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বেছে নেয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। গোড়ার দিকের তাত্ত্বিকেরা নির্ভরাতেক সাধারণভাবে উপনিবশীকরণ ও অসম বিনিময়ের পরিণাম হিসাবে দেখতেন। পরের দিকের তাত্ত্বিকেরা প্রান্তিক দেশগুলির নির্ভরতার ঐতিহাসিক-কাঠামোগত চরিত্রের বিষয়টি অনুসন্ধান করেছেন, যাতে রাষ্ট্রীয় ও শ্রেণী সংঘাতের (কাজেই এক সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা) উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দৃঢ়ভাবে বলা হয়েএছ যে 'সহযোগী-নির্ভরশীল উন্নয়ন'-এর ('associated-dependent development') মাধ্যমে নির্ভরতা ও উন্নয়ন সহাবস্থান করতে পারে।

সারণি নং ঃ ১

নির্ভরতা তত্ত্বের পুরনো ও নতুন বক্তব্যগুলির তুলনা

	সনাতনী নির্ভরতা (classical dependency)	'নব্য' নির্ভরতা ('New' dependency)
সাদৃশ্য		
গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন	
বিশ্লেষণের স্তর	জাতীয়	
মূল ধারণা	কেন্দ্র-প্রান্ত নির্ভরতা	
নীতির ফলিতার্থ	নির্ভরতা উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর	
প্রভেদ		
অনুসৃত পদ্ধতি	বিমূর্তকরণ, নির্ভরতার সাধারণ নকশার উপর গুরুত্ব	ঐতিহাসিক-কাঠামোগত, নির্ভরতার নির্দিষ্ট রূপের উপর গুরুত্ব
মূল কারণ	বাইরের শক্তির উপর গুরুত্ব ঃ অক্ষম বিনিময়, উপনিবেশবাদ	অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর গুরুত্ব : শ্রেণির সংঘাত, রাষ্ট্র
নির্ভরতার প্রকৃতি	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক-সামাজিক
নির্ভরতা ও উন্নয়ন	পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র (নির্ভরতা শুধুমাত্র অল্পোন্নতির জন্ম দেয়)	সহাবস্থান সম্ভব (সহযোগী-নির্ভরশীল উন্নয়ন)

পরিশিষ্ট - ক

সারণি নং ঃ ক-১

নির্ভরতা ও বিশ্ব ব্যবস্থা দৃষ্টিকোণের তুলনা

	নির্ভরতা	বিশ্ব ব্যবস্থা
বিশ্লেষণের একক	জাতি-রাষ্ট্র	বিশ্ব ব্যবস্থা
অনুসৃত পদ্ধতি	কাঠামোগত-ঐতিহাসিক ঃ জাতিরাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা	বিশ্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক চালিকা-শক্তি ঃ চক্রাকার ছন্দ ও ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঝোঁক
তাত্ত্বিক কাঠামো	দ্বিমাত্রিক ঃ কেন্দ্র-প্রান্ত	ত্রিমাত্রিক : কেন্দ্র-আধা-প্রান্ত-প্রান্ত
উন্নয়নের গতিমুখ	নিয়ন্ত্রণবাদী ঃ নির্ভরতা সাধারণত ক্ষতিকর	বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্ভাব্য ঊর্ধ্বগামিতা বা নিম্নগামিতা
গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু	প্রান্ত	প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র, আধা-প্রান্ত ও বিশ্ব অর্থনীতি

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৩ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ ওয়ালারস্টেইনের ব্যাখ্যা

গঠন

৩.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ

৩.২ আঞ্চলিক শ্রেণি বিভাজন

৩.৩ বিকাশের পর্যায়

৩.৪ তাত্ত্বিক পুন ঃ স্মরণ

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ

তাঁর 'The Modern World System : Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the sisteenth Century' গ্রন্থে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন আধুনিক পৃথিবীর উত্থানের সঙ্গো জড়িত ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করার এক তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করেন। মূলত গণতান্ত্রিক চরিত্রের এক আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার জন্ম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের পরে, যা ১৪৫০ থেকে ১৬৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের আত্মপ্রকাশের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। ওয়ালারস্টেইনের মতে, তাঁর তত্ত্ব ওই সময়ের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বহি প্রকাশের এক সর্বাত্মক ছবি তুলে ধরতে সাহায্য করে ও বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্য, বিশ্লেষণধর্মী তুলনাকে সম্ভব করে তোলে।

মধ্যযুগীয় ভূমিকা ঃ ষোড়শ শতকের আগে পশ্চিম ইউরোপ যখন গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে পা বাড়ায়, তখন পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজে 'সামন্ততন্ত্র'-এর প্রাধান্য ছিল। ১১৫০ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে জনসংখ্যা ও বাণিজ্য, দুই-ই বেড়ে ওঠে। ১৩০০ থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে অবশ্য এই বৃদ্ধি থেমে যায় ও মারাত্মক এক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। ওয়ালারস্টেইনের মতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সংকটের কারণগুলি সম্ভবত এইরকম :

১। কৃষি উৎপাদন হ্রাস বায় বা এক জায়গায় স্থির হয়ে যায়। অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর বিস্তারের সঙ্গো কৃষি উৎপাদকদের কাঁধে বাড়তি বোঝার সৃষ্টি হয়।

২। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির চক্রাবর্ত (cycle) তার সবথেকে কাম্য স্তরে পৌঁছে যায়। পরে তা সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে।

৩। আবহাওয়া বা জলবায়ুসংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় ও জনগণের মধ্যে মহামারী বেড়ে ওঠে।

ইউরোপের নতুন শ্রম বিভাজন

ওয়ালারস্টেইনের বক্তব্য ল এই যে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতেই ইউরোপ এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। অবশ্য এর জন্য আবশ্যক আলোচ্য বিশ্বটির ভৌগোলিক আয়তনের বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের শ্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলিকে তুলনামূলকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই প্রথম জাতীয় বা অন্যান্য রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বের সিংহভাগকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। এই নতুন বিশ্ব অর্থনীতি আগেকার 'এমপায়ার' (empire), অর্থাৎ শিল্প-ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের থেকে পৃথক ছিল কারণ তার কোন এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। 'সাম্রাজ্য'-গুলি নির্ভরশীল ছিল এমন এক সরকারি ব্যবস্থার উপর, যা একচেটিয়া মালিকানার সঙ্গে শক্তিপ্রয়োগ মিশিয়ে অর্থনৈতিক সামগ্রীগুলিকে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে চালিত করত। এই 'সাম্রাজ্য'-গুলির নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমারেখা ছিল, যার ভিতরে আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। আধুনিক গণতন্ত্রের কলাকৌশলের মাধ্যমেই কেবল আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি কোন 'সাম্রাজ্য'-এর রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হয়।

এই নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল এক আর্ন্তজাতিক শ্রম বিভাজন, যা বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ শ্রম ব্যবস্থাও নির্ধারণ করত। এই মডেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ভর করত বিশ্ব অর্থনীতিতে সেই অঞ্চলের অবস্থানের উপর। তুলনামূলক ভিত্তি হিসাবে ওয়ালারস্টেইন চারটি পৃথক শ্রেণীর প্রস্তাব করেন—কেন্দ্রীয়, আধা-প্রান্তিক, প্রান্তিক ও বহিঃস্থ (external)—যাদের মধ্যে বিশ্বের সবকটি অঞ্চলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই শ্রেণিগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিটি অঞ্চলের তুলনামূলক অবস্থানের পরিচয় দেয় এবং একই সঙ্গে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও অবহিত করে।

আঞ্চলিক শ্রেণি বিভাজন

(ক) কেন্দ্রীয় (core) : ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে সবথেকে বেশি উপকৃত হয় কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি বড় অংশ (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড) কেন্দ্রীয় অঞ্চল হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ইউরোপের এই অংশের রাষ্ট্রগুলি নিজেরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, ব্যাপক আমলাতন্ত্র ও বিশাল ভাড়াটে সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। এর ফলে স্থানীয় বু ্য়াশ্রেণী আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিজেদের স্বার্থে এই বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি টেনে আনে। গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদিধ ঘটলে, অল্প কিন্তু ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে থাকা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা খামার ও নির্মাণ শিল্পে শ্রমের যোগান দিতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সংকটের পরবর্তী সময়ে নগদ টাকার মাধ্যমে মজুর দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পরে কিছু স্বাধীন বা ছোট মা ারি

ভূস্বাম র উদ্ভব হলেও অন্যান্য বহু কৃষকই নিজেদের জমি হারাতে বাধ্য হয়। ই দরিদ্র কৃষকেরা প্রায়শই শহরে চলে আসতে থাকে এবং নগরভিত্তিক নির্মাণশিল্পে অল্প মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে থাকে। বাণিজ্য-সচেতন স্বাধীন কৃষকদের বঞ্চিত প্রভাব, যাজকতন্ত্রের (Pastoralism) উত্থান ও উন্নত প্রযুক্তির ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) **প্রান্তিক (Periphery) :** মানদন্ডের অন্য প্রান্তে অবস্থান প্রান্তিক অঞ্চলগুলির। কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার-বিহীন এই অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য রাষ্ট্র। এদের কাঁচামাল চলে যায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির হাতে ও এদের নির্ভর করতে হয় দমনমূলক শ্রমনীতির উপর। অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ককে কাজ লাগিয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত পুঁজির বেশিরভাগ অংশই বেদখল করে নেয়। পূর্ব ইউরোপ (বিশেষ পোল্যান্ড) ও লাতিন আমেরিকাতে প্রান্তিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। পোল্যান্ড ইউরোপের বাকী অংশে গমের প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠলে রাজারা অভিজাত ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা হারান। যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা ও সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শ্রমের সরবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূস্বামীরা তাদের বাণিজ্যিক জমিগুলিতে গ্রামীণ কৃষকদের জোর করে ‘ক্রীতদাস’-দের মত কাজ করতে বাধ্য করেন। স্পেন ও পর্তুগালের লাতিন আমেরিকা অভিযান স্থানীয় কর্তৃত্বের কাঠামোগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তাদের জায়গায় ওই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক দুর্বল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ‘হিস্পানিক’ (Hispanic) বংশোদ্ভূত স্থানীয় শক্তিশালী ভূস্বামীরা অভিজাত, পুঁজিবাদী কৃষকে পরিণত হন। স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা, আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি, দমনমূলক শ্রমনীতি ও জোর করে খ নতে কাজ করানোর মাধ্যমে ইউরোপে সস্তায় কাঁচামাল রপ্তানি করা সম্ভব হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের থেকে এই দুই প্রান্তিক অঞ্চলের শ্রমব্যবস্থা পৃথক এই কারণে যে এখানে নিজেদের ব্যবহারের জন্য নয়, ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির স্বার্থে পণ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, পূর্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায় বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ধনী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে সাহায্য আদায় করতে সক্ষম হয়।

(গ) **আধা-প্রান্তিক (semi-periphery) :** এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি, আবার তেমনই আছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে তুলনামূলক ভাবে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছতে চাওয়া প্রান্তিক অঞ্চলগুলি। এরা প্রায়শই কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলির মাঝখানে থেকে ‘বাফার’-এর (bueffer) ভূমিকা পালন করে। অধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় ক্ষমতাবান ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কে এক চাপা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায়। আলোচ্য সময়ে যে সব ক্ষয়িষ্ণু বা পতনশীল কেন্দ্রীয় অঞ্চল আধা-প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত হয়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল পর্তুগাল ও স্পেন। এই সময়ে অন্যান্য আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি ছিল ইতালি, দক্ষিণ জার্মানি ও দক্ষিণ ফ্রান্স।

অর্থনৈতিক ভাবে, আর্ন্তজাতিক ব্যাঙ্কিং বা উচ্চ মূল্যের ও উচ্চ মানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই

অঞ্চলগুলির ভূমিকা ছিল সীমিত এবং ক্রমশই নিম্নগামী। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মত এরা অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেমনভাবে প্রাধআন্য বিস্তার করতে পারেনি এবং তার ফলে নিজেরা সেইরকম উপকৃতও হয়নি। এক দুর্বল গণতান্ত্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ফলে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলের ভূস্বামীরা ভাগচাষের (sharecropping) দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর ফলে ভূস্বামীদের ফলন না হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং একই সময়ে তাঁরা জমি থেকে মুনাফা ও ভূস্বামীর মর্যাদা বা সম্মান উপভোগ করতে থাকেন।

ওয়ালারস্টেইনের মতে, এ কথা সত্যি যে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি দ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু এই আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি নিজেরাই প্রায়শ প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে শোষণ করে, যার দৃষ্টান্ত হল স্পেন ও পর্তুগালের লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যগুলি। যেমন, দমনমূলক নীতির সাহায্যে স্পেন তা উপনিবেশগুলি থেকে সোনা ও রূপা আমদানি করে তার মোটা অংশই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্য ব্যবহার করত।

(ঘ) **বহিঃস্থ (external) :** এই অঞ্চলগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির বাইরে থাকতে পেরেছিল। রাশিয়া এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পোল্যান্ডের পথে না গিয়ে রাশিয়া মূলত তার নিজস্ব বাজারের জন্য গম উৎপাদন করত। এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গেও রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল— অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই তার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়াও রুশ রাষ্ট্রের বিশাল শক্তি তাকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করত ও বিদেশি বাণিজ্যিক প্রভাবকে সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ রাখত।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

বিকাশের পর্যায়

আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে ওঠে কয়েক শতাব্দী ধরে, যে সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি এই ব্যবস্থায় তাদের তুলনামূলক অবস্থানগুলি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে ওয়ালারস্টেইন চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এগুলিকে দুটি মূল পর্যায়ে বিভক্ত করব।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় :

এটি হল ১৪৫০-১৬৭০ সালের মধ্যে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থানের পরবর্তী সময়কাল। উদীয়মান বিশ্ব অর্থনীতিকে হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য এক বিশ্ব সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হলে, পশ্চিম ইউরোপের তৎকালীন সবকটি রাষ্ট্র এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে বেশীরভাগ রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য এই পদ্ধতিগুলির সাহায্য নেয় :

(ক) **আমলাতন্ত্রীকরণ :** এই প্রক্রিয়া রাজার সীমিত, অথচ বর্ধনশীল ক্ষমতার অনুকূলে কাজ করে। কর আদায় করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজারা প্রকৃতপক্ষে টাকা ধার নেওয়া ও ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রকে প্রসারিত করার ক্ষমতা বাড়িয়ে নেন। এই পর্যায়ের শেষে রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে

ওঠেন ও এক 'নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র'-এর (absolute monarchy) স্থাপনা করেন।

(খ) **স্থানীয় মানুষদের সমজাতীয় করে তোলা (Homogenization of the local population) :** নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে ও দেশীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দিতে বহু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বিতাড়িত করে। স্থানীয় মানুষ ও রীতিনীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত এই সব স্বাধীন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে বিপজ্জনক বাধা হিসাবে মনে করা হত। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন থেকে ইহুদীদের বিতালিত করা হয়। একইভাবে, প্রোটেস্টান্ট বণিকেরাও প্রায়শই ক্যাথলিক চার্চের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ত। ক্যাথলিক চার্চের মত এক বহুরাষ্ট্রীয় (transnational) প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিকে বিপজ্জনক মনে করত।

(গ) কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রকে সমর্থন ও নতুন রাষ্ট্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ষীবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছিল।

(ঘ) ওই সময়ে উদ্ভূত স্বৈরতন্ত্রের (absolutism) ধারণা রাজন্ত্রকে আগেকার প্রচলিত আইনকানুন থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত করেছিল। এই কারণে রাজা আগেকার সামন্ততান্ত্রিক আইনের হাত থেকে মুক্তি পান।

(ঙ) সর্বোচ্চ মুনাফা উপার্জন করতে ও স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে শক্তিশালী করে তুলতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে বহুমুখী করে তোলা হয়েছিল।

১৬৪০ সালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এই উদীয়মান অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে তোলে। স্পেন ও উত্তর ইতালি আধা-প্রান্তিক স্তরে অবনীত হয়, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও আইবেরিয়ান (Iberian) আমেরিকা প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত হয়। ইংল্যান্ড ধীরস্থির ভবে কেন্দ্রীয় মর্যাদা পাবার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এই সময়ে ইউরোপে শ্রমিকদের মজুরি নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। মজুরি হ্রাসের ঘটনাটি ঘটে ইউরোপের বেশীরভাগ পুঁজিবাদের কেন্দ্রে। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় উত্তর ও মধ্য ইতালির শহরগুলিতে এবং ফ্ল্যান্ডাসে। এই ব্যতিক্রমের কারণ, এই শহরগুলি বাণিজ্যের পুরানো কেন্দ্র ছিল ও শ্রমিকেরা শক্তিশালী আর্ত-রাজনৈতিক গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল পরিমাণ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার মালিকদের ক্ষমতা শ্রমিকদের প্রতিরোধের সামনে ভেঙে পড়েছিল। ইতিমধ্যে লগ্নি করার জন্য বিশাল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমা করে ইউরোপের অন্যান্য অংশের মালিকশ্রেণী এই মজুরি হ্রাস থেকে মুনাফা করেছিল।

কোনও ছোট উচ্চস্থানীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে আমেরিকা বা প্রাচ্যের সঙ্গে দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্য খুবই লাভজনক ছিল—মুনাফার পরিমাণ দুশো থেকে তিনশো শতাংশ ছাড়িয়ে যেত। রাষ্ট্রীয় সহায়তা এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ নিতে পারত না। পরে অবশ্য অ তলান্তিক মহাসাগরের দু পারের এই বাণিজ্যের মুনাফা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে এবং ইউরোপে কৃষি ও

শিল্পের উপর বণিক বা ব্যবসায়ীদের কব্জা দৃঢ়তর হতে থাকে। ক্ষমতাশালী বণিকেরা উৎপাদনের আগেই সামগ্রী কিনে নিয়ে মুনাফা সঞ্চয় করতেন। পরে উৎপাদিত সম্পূর্ণ পণ্যগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বণিকেরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করতেন এবং আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। এই শক্তিশালী বণিক শ্রেণীই ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় (অষ্টাদশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়) :

এই সময়কালের বৈশিষ্ট্য হল কৃষি নয়, শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিকাশ। শিল্প উৎপাদন বেশী গুরুত্ব পেতে থাকায় এই সময়ে এইসব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় :

(ক) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সক্রিয়ভাবে নতুন নতুন বাজার খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে।

(খ) ভারত মহাসাগরীয় ব্যবস্থার মত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থাকে বর্ধনশীল ইউরোপীয় বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করার পরে এই অঞ্চলগুলি এবং আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে প্রবেশ করে। এশিয়া ও আফ্রিকা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে এই ব্যবস্থায় যোগ দেয়।

(গ) প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্তর্ভুক্তি আয়ত্তাধীন উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মতো অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে তুলতে সক্ষম হয়।

(ঘ) এই পর্বে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি কৃষি ও শিল্পের এক মিশ্র ব্যবস্থা থেকে স্রেফ শিল্প ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে। ১৭০০ সালের আগে ইংল্যান্ড ছিল কৃষি ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ উৎপাদক। লক্ষ্য করা যায় যে ১৯০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল।

(ঙ) ১৯০০ সালের মধ্যে যখন নির্মাণ শিল্প বেশী গুরুত্ব পেতে শুরু করে, তখন কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি প্রান্তিক ও আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে শিল্পের বিকাশকে উৎসাহ দিতে থাকে, যাতে তারা ওই অঞ্চলগুলিতে যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে পারে।

তাত্ত্বিক পুন স্মরণ (Theoretical reprise)

ওয়ালারস্টেইনের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি এক গতিশীল ব্যবস্থা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক বৈশিষ্ট্য অবশ্য অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই ব্যবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান চালালে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হল এর মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিই সবথেকে বেশী লাভবান হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রান্তিক (কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধা-প্রান্তিক) অঞ্চলের কাঁচা মালের বিনিময়ে উৎপাদিত সম্পূর্ণ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বিশাল মুনাফা প্রান্তিক অর্থনীতির ক্ষতি করে কেন্দ্রকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে রে ফলে প্রান্তিক অঞ্চলের প্রত্যেকেই আরও দরিদ্র হয় বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রতিটি নাগরিকই আরও ধনী হয়ে ওঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রান্তিক অঞ্চলের ভূস্বামীরা দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করে ও শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়, কারণ ভূস্বামীরা শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বেশীরভাগ অংশই নিজেদের জন্য বেদখল করতে সমর্থ হয়। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে বহু ভূমিহীন গ্রামীণ কৃষক মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হয় ও তাদের জীবনযাত্রার মান ও আয়, দুই-ই হ্রাস পায় ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওয়ালারস্টেইন পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশকে পৃথিবীর মানুষের এক বিরাট অংশের পক্ষে ক্ষতিকর হিসাবেই বিবেচনা করেছেন।

এই তত্ত্বের মাধ্যমে ওয়ালারস্টেইন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কেন বিশ্বের উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের পতনের পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপকে এক প্রধান বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। ভৌগোলিক বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি যেখানেই প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শ্রমনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতির মধ্যে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে, কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক ও আধা প্রান্তিক অঞ্চলগুলির সম্পর্ক কিন্তু অপরিবর্তনশীল নয়, আপেক্ষিক রয়ে যায়। যেমন, প্রযুক্তিগত সুবিধা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে পারে ও কয়েকটি প্রান্তিক বা আধা-প্রান্তিক অঞ্চলেও পরিবর্তন আনতে পারে। ওয়ালারস্টেইন অবশ্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার ইতিহাস প্রমাণ করে য তা এক তির্যক বিকাশের জন্ম দিয়েছে, যা সকলের মঙ্গাল করার বদলে বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অর্থনৈকি ও সামাজিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।